Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-1 July 2025

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নরকের প্রহরী’
কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণ

চন্দনকুমার কুণ্ডু

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/10_Chandan-Kumar-Kundu.pdf

সারসংক্ষেপ: নরক পরলৌকিক স্থান। পরলৌকিক স্তরে শাস্তি দান ও শাস্তি ভোগের স্থান। মৃত্যুর দেবতা যমের স্থান নরক। মানুষের মৃত্যুর পর যমদূত বিচারের জন্য মানুষের আত্মাকে যমরাজের কাছে নিয়ে আসে। মৃতদের পাপের ধরণ ও তীব্রতা অনুযায়ী শাস্তি হিসাবে নির্দিষ্ট নরকে পাঠানো হয়। গল্পে তিনজন কিশোর, কেষ্ট আর মালিক নিয়ে একটি সার্কাসের দল। সার্কাসে ভুতো, শশী ও গোবরা তিনজনে যথাক্রমে কাটামুণ্ডু, জাল কুমারী ও কুম্ভীপাকের পিশাচ সেজে দর্শকদের নরক প্রদর্শন করাতে গিয়ে তারাই যেন নরকের প্রহরী হয়ে উঠেছে, ভোগ করেছে নরক যন্ত্রণা। বর্তমান প্রবন্ধে গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত কীভাবে মানবিক সত্তার জয় ঘোষণা করেছেন তাই প্রাবন্ধিকের আলোচনার বিষয়।

সূচক শব্দ: নরক, প্রহরী, অন্ধকার, কাটা মুণ্ডু, সার্কাস।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম নভেম্বর ১০, ১৯৩৩। আদি নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরের কাছে ইছাপুর গ্রামে। পড়াশোনা দেউঘর বিদ্যাপিঠ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র এবং ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৫৩ থেকে ‘পরিচয়’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদক হন। ‘কালান্তর’ পত্রিকায় ছদ্মনামে লিখতেন। সারা ভারতে ‘প্রগতি’ লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস : ‘তৃতীয় ভুবন’, ‘বিবাহ বার্ষিকী’, ‘শক মিছিল’, ‘চর্যাপদের হরিণী’, ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’ ইত্যাদি। দীপেন্দ্রানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘নরকের প্রহরী’ গল্পটি ১৩৬৫ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি প্রথমে ‘চর্যাপদের হরিণী’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরর্বতীকালে ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’ সংকলনের নতুন সংস্করণে ‘নরকের প্রহরী’ স্থান পায়।

হিন্দু ধর্মমতে নরক হচ্ছে পাপীদের শাস্তি ভোগ করার স্থান এবং নরক মৃত্যুর দেবতা যমের আবাস্থল। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মমতে নরকের সংখ্যা আঠাশটি। স্বর্গ বা নরকের অবস্থান সাধারণত অস্থায়ী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। শাস্তির পরিমাণ শেষ হওয়ার পর আত্মারা তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে নিম্ন বা উচ্চতর প্রাণী হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে। ‘অগ্নিপুরাণ’এ শুধু মাত্র চারটি নরকের উল্লেখ আছে। কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সাতটি নরকের কথা বলা হয়েছে। যেমন, পুত (নিঃসন্তানদের জন্য), আভিচি (তরঙ্গাহীন, তাদের জন্য যারা পুনর্জন্মের জন্যে অপেক্ষা করছে), সংহতা (পরিত্যক্ত, দুষ্ট মানুষদের জন্য), তাম্রিশ (অন্ধকার, এখানে নরকের অন্ধকার শুরু হয়), রিজিশা (বহিষ্কৃত, এখানে নরকের যন্ত্রণা শুরু হয়), কুদমালা (কুষ্ঠ, পুনর্জন্ম হতে চলেছে যাদের, তাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ নরক), কাকোলা (কালোবিষ, অতল গর্ত, তাদের জন্য যারা চিরতরে নরকে দোষী সাব্যস্ত এবং যাদের পুনর্জন্মের কোনো সম্ভবনা নেই), মনু স্মৃতিতে একুশটি নরকের উল্লেখ আছে। ‘ভাগবত’ পুরাণ অনুসারে নরক পাতাল ও গরভোদক মহাসাগরের সাতটি রাজ্যের মধ্যে মহাবিশ্বের নীচের অংশ। নরক মহাবিশ্বের দক্ষিণে পাতালে পিতৃলোকে অবস্থিত। দেবী ‘ভাগবত’ পুরাণে উল্লেখিত হয়েছে যে, নরক হলো মহাবিশ্বের দক্ষিণাঞ্চল, পৃথিবীর নীচে কিন্তু পাতালের উপরে। বিষ্ণুপুরাণ উল্লেখ করেছে যে, নরক মহাবিশ্বের

নীচে অবস্থিত, সে দিকটি যম দ্বারা পরিচালিত এবং মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত। পিতৃলোক যমের রাজধানী। যেখানে যম তাঁর ন্যায়বিচার প্রদান করেন।

মৃত্যুর দেবতা যম, যম যমদূত নিয়োগ করেন বিচারের জন্য, যমের কাছে সমস্ত জীবের আত্মাকে নিয়ে আসার জন্য। সাধারণত, মানুষ ও জন্তু-সহ সমস্ত জীবিত প্রাণীরা মৃত্যুর পরে যমালয়ে যায়। সেখানে তাদের বিচার হয়। যম পুণ্যবানদের স্বর্গে পাঠান। এবং মৃতদের দুর্দশা মূল্যায়ন করে বিচারের রায় দেন। তাদের পাপের তীব্রতা ও ধরণের সঙ্গে উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে উপযুক্ত নরকগুলিতে পাঠান। সংসার থেকে মুক্তি না পাওয়া কোনো ব্যক্তি এবং স্বর্গের নির্ধারিত আনন্দের পরে বা নরকের শাস্তি শেষ হওয়ার পরে অবশ্যই তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। যমদূতকে বিভিন্ন নরকে পাপীদের উপর শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করতে হয়। ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’ই প্রথম গ্রন্থ যেখানে নরকের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি একাধিক নরকের নামকরণ শুরু করে। মহাকাব্যগুলি সাধারণ ভাবে নরকের বর্ণনা করেছে ছায়াহীন ঘন জঙ্গল হিসাবে, সেখানে জল নেই এবং বিশ্রাম নেই। যমদূতরা প্রভুর আদেশে আত্মাদেরকে কষ্ট দেয়।

দীপেন্দ্রনাথের ‘নরকের প্রহরী’ গল্প একটি ছোটো খাটো সার্কাস দলের কাহিনি। খেলোয়াড়দের নারকীয় জীবন অভিজ্ঞতা এই গল্পের উপজীব্য। পুরনো বসন্তের ক্ষতের দাগ ধরা আয়নার বর্ণনার সঙ্গে সার্কাসের খেলোয়াড় ভুতোর মুখের বর্ণনায় কাহিনি শুরু। সাজঘরের আয়নার জীর্ণদশা থেকে শুরু করে ভুতোর সার্কাসে ব্যবহার করা জৌলুসহীন মুকুটের বর্ণনায় আর এক নরকের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সার্কাসের খেলা শুরুর আগে ভুতো চোখের তলায় কাজল দিয়েছে, কপালে দিয়েছে তেল সিঁদুরের ফোঁটা আর গালে মেখেছে বাজারের খেলো লাল পাউডার। গল্পকারের বর্ণনায় দেখি, ‘... তিনবছর পরে এখন ভুতোর ভয় নেই, আর মুকুটটাও মিইয়ে ফ্যাকাসে মেরে গেছে। জায়গায় জায়গায় কালো ছোপ ধরেছে। ঠিক ভুতোর গালের মতই,...’ একই সঙ্গে গল্পকার জানিয়েছেন, ‘ভুতোর বয়স ষোল।’ যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে তার বয়সও যেন থমকে গেছে।

তিনটি ছোঁড়া, কেষ্ট আর মালিক এই নিয়ে সার্কাসের দল। সার্কাসের মালিকের অবস্থা পড়তির দিকে। ছেঁড়া তাবু, বাইরে কাপড়ের ওপর কাঁচা হাতে আঁকা পাতালের কয়েকটি দৃশ্য। ভুল বানানে লেখা দলের নাম। এর আগেই আমরা দেখেছি বাইরের দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সার্কাসের আর এক চরিত্র কেষ্টকে, ‘ছেঁড়া প্যান্ট, ছেঁড়া গেঞ্জি, মুখে চুনকালি’ মেখে নানা অঙ্গাভঙ্গি করে বাইরের দর্শকদের মনোরঞ্জন করে চলে। “শ্রী কেষ্ট হটাৎ লোহার চাকতি নামিয়ে রেখে, হাতের প্রায় শেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে মুখে চোখে তীব্র ভয় আর আতঙ্কের ছবি ফুটিয়ে গলা দিয়ে একটা জান্তব বীভৎস আর্তনাদ করে দর্শকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে।

ভুতো, শশী ও গোবরা এই তিন কিশোর ‘নরকের প্রহরী’ গল্পের এবং অনামী সার্কাস দলের কুশীলব। পড়তি সময়ের ব্যবসায় এই তিনজন দর্শককে নরক প্রদর্শন করে। তাবুর ভেতরে গাদাগাদি করে জনা বিশেক লোক দাঁড়াবার জায়গা, তারপর বাঁশের বেড়ার ওদিকে পর্দা ফেলা। পর্দার ভেতরে কাপড়ের দেওয়ালের তিনটি ঘর। সেই তিনটিতে দর্শকদের নরক প্রদর্শন করা হয়। প্রথম ঘরটা কাটামুণ্ডুর সে নরকের পাহারাদার। সেই যমের দূত। তার কপালে লাল রক্তের ফোঁটা।’ যার ভয়ঙ্কর দুটো চোখে জিঘাংসা, গোঁফ চুঙিয়ে ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ে।’ পরের ঘরটা জাল কুমারীর, মাকড়শার জালে তৈরি মেয়ে, তিনটে ধড়ে একমাথা পিশাচ। শরীরটা জালের অথচ মাথা মানুষের। তার লম্বা চুল, টানা চোখ, রাঙা ঠোঁট, কপালে কাঁচপোকার টিপ। এই সুন্দরীর এমন দশা কী করে হলো জিজ্ঞাসা করেছেন মালিক। পরক্ষণে নিজেই উত্তর দিয়েছেন গলা চড়িয়ে। তিনি যেন পৃথিবীর গোপন সত্য প্রকাশ করেছেন, ‘জ্যান্তে এই মেয়ে ছিল অপ্সরার পারা। সুন্দরী, লক্ষ্মীর মতো কাজে — গুণে দড়। এর সব ছিল। কিন্তু নিজের রূপের গোমরে, গুণের দেমাকে সুন্দরীর মাটিতে পা পড়ত না। ... মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গ করল। এখন যার দুচোখে ক্লান্তি, বেদনা আর অসহায়ত্ব।’ তাই দেখুন অনন্তকাল একে মাকড়শার জালের শরীর আর ওই সুন্দর মুখ নিয়ে নরকে থাকতে হবে। মালিক জাল কুমারীকে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু জাল কুমারীর বেশে প্রথম প্রতিবাদ করেছে শশী। সব শেষের ঘরে থাকে কুম্ভীপাকের পিশাচ।

তিনটে ধড়, অথচ একটা মাথা, হাত, পাগুলো উল্টে পাল্টে গেছে। আর বাড়তি দুটো ধড়ের কারণে সব মিলিয়ে বীভৎস, চোখে মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। নিজের শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে বেঁকিয়ে, মনটাকে চমকে, ভেঙে প্রস্তুত হচ্ছে নরকের পালা। মালিক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'ছোটবেলায় এ চুরি করত, মিথ্যে কথা বলত। বড় হয়ে... ' অথচ গোবরার গায়ে বড়ো ব্যাথা, গোবরা ছোটো এবং বড়ো ভীতু। চুরি করে ভুতোর একটা বিড়ি খাওয়ার সাহসও নেই তার। তবুও তাকে নরকে ঢুকতে হয়েছে।

ভুতো, শশী আর গোবরা তিনটি চরিত্রের নরক যন্ত্রণা দেখানো হলেও ভুতো অর্থাৎ কাটামুণ্ডু বা নরকের পাহারাদার যমদূতের যন্ত্রণাই লেখক যেন বেশি করে দেখাতে চেয়েছেন। ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সের ভেতর হাঁটু গেড়ে, কুঁজো হয়ে বসে, বাক্সের ওপরের তক্তার মাঝখানটা গোল করে কাটা। সেই গোল ফুটো দিয়ে মাথাটা গলিয়ে উপরে তুলে রাখে। এরপর মালিক এসে ন্যাকড়া দিয়ে ফুটোটা বুজিয়ে দেয়। বেড়ার এপাশে দাঁড়ালে মনে হয় কাঠের একটা বাক্সের ওপরে এক টুকরো মাটি, তার ওপর একটা কাটামুণ্ডু। গলায় কাদা আর লাল রং এবং ঠোঁটের কষে লাল রং গড়িয়ে পড়ছে। ভুতো কাটামুণ্ডুর অভিনয় করতে করতে একসময়য় সে যেন নিজেকেই দেখতে পেয়েছে যমদূত রূপে। যে নরকের পাহারাদার। 'নরক। অন্ধকার। বাতাস নেই। আগুন। তেল ফুটছে কড়াইয়ে। মানুষ ফুটছে তেলে। চিৎকার। চিৎকার।' ছোটো ছোটো বাক্যে নরকের এক একটা ছবি। এতে নরকের ভয়ঙ্করতা আরো বেড়ে গেছে। আর সেই ভয়ঙ্কর নরক পাহারা দিচ্ছে কাটামুণ্ডু মানে যমদূত।

পর্দা উঠতেই অনেকগুলো মাথা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দু তিনটি বাচ্ছা, একটি বউ। সবাই ভুতোর দিকে তাকিয়ে। সার্কাসের মালিক দর্শকদের জানিয়েছেন, এই হলো নরকের পাহারাদার। এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে যমরাজ ও নরক থেকে নড়তে পারে না। যার পাপের ভোগ পূর্ণ হয়েছে, স্বর্গে যাবে সে — এই হুকুম ছাড়া এক পা বেরতে পারে না। পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তখন যখন মালিক জিজ্ঞাসা করেছেন —

'-বল তুমি কে?

-আমি যমদূত!

-তোমার কাজ কি?

-নরক পাহারা দেওয়া।'

মাঝবয়েসী একটি বউ তার মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুর; সে একটা হাত শক্ত করে বাঁশের বেড়া চেপে ধরেছে। বিস্মিত সন্ত্রস্ত দুটি চোখ কাটামুণ্ডুকে দেখছে। তার মুখে চোখে পাপ দেখতে পেয়েছে নরকের প্রহরী, কাটামুণ্ডু। তাই 'একটা লঙ্কা পায়রার মতো ছোকরা' এটাকে 'মিছিমিছি' বললে রাগে, ঘৃণায় বিদ্বেষে ভুতো দাঁত ঘষটেছে। কেননা জীবনে এই একটি জায়গায় তার জিত। সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে তিনটি প্রশ্ন, 'কেন, নরক কি নেই? যমদূত কি নেই? পাপ করলে কি নরকে যেতে হয় না?' এর উত্তরও তার ছোটোবেলার জীবন থেকেই পাওয়া। ছেলেবেলায় নরকের গল্প শুনেছে সে তার 'রাক্ষুসী মার' কাছে। তার মায়ের বড়ো ভয় ছিল ভুতো বখে যাবে। তাই পাপের শাস্তির গল্প বলে তাকে সাবধান করত, ভয় দেখাত। তখন বুঝতে না পারলেও ষোল বছর বয়সী ভুতোর বুঝতে আসুবিধা হয় না যে, তার মা আসলে ভুতোকে সামনে বসিয়ে নিজেকেই নরকের গল্প শোনাত। ভুতোর বিশ্বাস তার মা নরকেই পচে মরছে। মাঝ বয়সী বউটির মুখে যেন সেই একই পাপের চিহ্ন দেখেছে সে। 'নরকের গল্প বলতে বলতে মা-র চোখে যেমন আতঙ্ক ফুটে উঠত, কাটামুণ্ডু দেখতে দেখতে বউটার চোখে তেমনি ভয়। আজ বোঝে মায়ের আতঙ্কের মূলে তার পাপ ছিল। বউটার চোখের ডরেও নিশ্চয়ই তারই জীবনের ছায়া।' ভুতো প্রতিটি দর্শকের মুখে পাপ দেখতে পেয়েছে। বুড়ো হিন্দুস্থানি লোকটি, সে বিহ্বল সেই বউটির প্রায় গায়ের ওপর পড়েছে তার চোখেও পাপ; আবার সেই ছোকরার চোখেও পাপ দেখেছে। পাশের তাবুর 'দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের' খেলা দেখানো মেয়েটির মধ্যেও পাপ দেখেছে সে। তাই নরকের ঘন অন্ধকার, সেখানে বাতাস নেই, আছে শুধু তৃষ্ণা, ঘাম আর গরম তেল। সেই মানুষগুলোর গড়াতে গড়াতে, বমি করতে করতে নিঃস্বাশের জন্য কালোর দিকে ছুটে আসা, নীল আগুন।

অন্ধকার। মানুষগুলোর চোখ, নখ, কালোর নাচ, তার মধ্যে মাকড়শার জাল, কালোর যেন জাল কুমারীতে পরিণত হওয়ার চিত্র দেখতে পেয়েছে কাটামুণ্ডু রূপী ভুতো। তার এমন চিন্তনের মধ্যেই কালোর গলায় থাবা বসিয়েছে বাঘটা। এও যেন নরকের প্রাপ্ত শাস্তি। যা নরকের প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি বলা চলে। গল্পকার দেখিয়েছেন, ‘পাপ। তার মায়ের পাপ। তার জন্মে পাপ। তার জীবনে পাপ। এই তাঁবুটায় মিথ্যে, প্রতারণা, অত্যাচার আর যন্ত্রণার পাপ।’ পৃথিবীটাই শুধু পাপ। তাই নরকের পাহারাদারের কটমট করে তাকানোয় বউটিকে ভয় পেতে দেখে বা বাচ্চাটার কান্না শুনে উৎকট আনন্দ হয়েছে তার। তেমনি ভাবেই তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে ওই ‘মিছিমিছি’ বলে হেসে অস্বীকার করা ছোকরার উপর। সে তাকেই নরকের শাস্তি দিতে চেয়েছে।

‘নরকের প্রহরী’ গল্পে ভুতো, শশী, গোবরা মেলার দর্শকদের নরক দর্শন করিয়েছে। এই নরক দর্শন করাতে গিয়ে অনেক খানি নরক দর্শন হয়েছে তাদের নিজেদের। নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে তারা। নরক যে পাপীর স্থান, পাপীর শাস্তি পাওয়ার জায়গা সে কথা ছোটোবেলা থেকেই ভুতো শুনেছে তার মায়ের মুখ থেকে। সেই মা যে ভুতোকে সামনে রেখে নিজেকেই শুনিয়েছে নরকের শাস্তির কথা এবং আতঙ্কিত হয়ে শেষে আত্মহত্যা করে মরেছে। নরকের প্রহরী সেজে ভুতো পৃথিবীর সর্বত্র পাপ দেখেছে। সে যেন সত্যি সত্যিই নরকের প্রহরী হয়ে উঠেছে একসময়য়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যে নরকের প্রহরী নয়, শ্যামল ডাঙার ভুতো, তার মানব সত্তায় যে তার বড়ো পরিচয় তা দিয়ে গল্প শেষ করেছেন গল্পকার। তাই মাঝ বয়সী বউটি দুহাত জোড় করে তাকে প্রণাম করলে তার ‘ইচ্ছে গেল শ্রী কেষ্টর মতো, একটা জন্তুর মতো, একটা দানোয় পাওয়া জওয়ান ছেলের মতো, চিৎকার করে বলে, আমায় প্রণাম কোরো না, আমি কাটামুণ্ডু নই। আমি যমদূত নই। আমি ভুতো, শ্যমল ডাঙার ভুতো।’ জালকুমারী সাজা শশী মালিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন ভুতোর অন্তরকেও জাগিয়ে দিয়েছে — তুমি কে জাল্কুমারী! / - আমি জানি না। / তুই কে কাটা মুণ্ডু? / আমি জানি না। / তুই যমদূত? / আমি জানি না। / তুই নরকের পাহারাদার? / আমি জানি না। / তুই ভুতো? আমি জানি না।’ এর আগেই নিজেকে শ্যমল ডাঙার ভুতো বললেও নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে সে যেন সত্যিই নরকের প্রহরী হয়ে গেছে। পাঠকও যেন কাটামুণ্ডুর মধ্যেই ভুতোকে হারিয়ে ফেলতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর তখনই একটা বোকা বোকা চাষা চেঁচিয়ে উঠে বলেছে, ‘লে ব্বাবা। তোমার কাটামুণ্ডুর চোখে দেখি মানুষের মতো জল।’ দীপেন্দ্রনাথ ভুতোর মানবিক সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে গল্পে ইতি টেনেছেন। শেষ পর্যন্ত ভুতোর সত্তা যে কাটামুণ্ডু দখল করে নিতে পারেনি, তার মানবিক সত্তারই জয় হয়েছে, এখানেই গল্পকারের শিল্পী সত্তার জয় হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যধারা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩
২. ‘কথা প্রগতি : দীপেন্দ্রনাথ’, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশ ২০০৪

লেখক পরিচিতি: চন্দনকুমার কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।